মৃত্যুদণ্ড: পক্ষ-বিপক্ষ মত ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন

আহম্মদ উল্লাহ*

সারসংক্ষেপ : মানুষ স্বাভাবিকভাবেই অপরাধকে ঘৃণা করে এবং ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায়বিচার বা ন্যায়কে সমর্থন করে। আমরা আইনের শাসনের মধ্যে বসবাস করি এবং অপরাধ আমাদের সভ্যতার উপযোগী নয় বা গ্রহণযোগ্য নয় বলে তাকে ঘৃণা করি বা পরিহার করি। অধিকাংশ সাধারণ মানুষেরই এমন অনুভূতি রয়েছে যে অপরাধ জাতীয়ভাবে ঘৃণার, অমর্যাদার এবং বৈশ্বিকভাবে একটি সমস্যাপূর্ণ বিষয় এবং অপরাধ প্রকৃতিগতভাবেই ভয়ংকর, উদ্বেগজনক, অপ্রয়োজনীয়, ব্যয়বহুল, নিষিদ্ধ ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়, যা কিনা সাম্প্রতিক বাস্তবতায় বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১] জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার ও সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সাথে অপরাধের ধরনের মধ্যেও নানা পরিবর্তন এসেছে। পাশাপাশি অপরাধের নানা ধরনের বিপরীতে শাস্তিরও নানা ধরন প্রচলিত রয়েছে। গুরুতর অর্থাৎ চরম অপরাধের বিপরীতে তেমনই একটি শাস্তির ধরন হলো মৃত্যুদণ্ড। তবে মৃত্যুদণ্ডের বিষয়ে ঐতিহাসিকভাবেই বহমান রয়েছে নানা বিতর্ক। সেদিকে লক্ষ রেখে শাস্তির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের বিষয়টি ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টির যৌক্তিকতা বর্তমান বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

(১)

প্রতিটি সমাজই কিছু আইন দ্বারা শৃঙ্খলিত। এই আইনগুলো সাধারণ কল্যাণ ও ভাল-মন্দ সম্পর্কে সমাজের উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ বা প্রতিনিধিত্ব করে। মানুষ নৈতিকভাবে সীমাবদ্ধ প্রাণী। এ কারণেই কখনও কখনও সে নিজ সম্প্রদায়ের আইন লঙ্ঘন করে। সমাজ, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্র নিজস্ব মূল্যবোধ, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা বজায় রাখতে, অনৈতিক বা বেআইনি আচরণ রুখতে নানারকম পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তেমনই একরকম পদক্ষেপ শাস্তি। অন্যভাবে বলা যায়, শাস্তি এক অর্থে মানুষের নৈতিক, অনৈতিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ শাস্তি হলো কিছু অপ্রীতিকর পরিণতি বা অভিজ্ঞতা। যথা: কারাদণ্ড, যন্ত্রণা বা হয়রানি, নির্বাসন অথবা মৃত্যু, যেগুলো রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর আইন ভঙ্গের কারণে আরোপ করে।[২] আদিম সমাজে ব্যক্তি যে কোনো অবস্থায় আইন ভঙ্গ

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

করলেই তাকে শাস্তি ভোগ করতে হতো। চাই সে ঐচ্ছিক, অনৈচ্ছিক, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যেভাবেই করুক না কেন। আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় অবশ্য বলা হয় ব্যক্তি ঐচ্ছিকভাবে, অন্য কোনো অবস্থার (যেমন: বাহ্যিক ভীতি, মানসিক বিকৃতাবস্থা, ক্ষমাযোগ্য, অজ্ঞাত ইত্যাদি) দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে যদি কোনো অন্যায় করে বা আইন ভঙ্গ করে বা মূল্যবোধের অবমূল্যায়ন বা অপমান করে, তবে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। শাস্তির প্রকৃতি সম্পর্কে ইংরেজ সাংবাদিক, রাষ্ট্র-দার্শনিক ও ঔপন্যাসিক William Godwin তাঁর *Enquiry Concerning Political Justice* গ্রন্থে বলেছেন:

> Punishment is generally used to signify the voluntary infliction of evil upon a vicious being, not merely because the public good demands it, but because there is apprehended to be a certain fitness and propriety in the nature of things that render suffering abstractly from the benefit to result the suitable conconcomitant of vice.[৩]

অর্থাৎ শাস্তি হচ্ছে মারাত্মক মন্দ কর্মের বিপরীতে যথার্থ ও সঙ্গতির নিমিত্তে এক ধরনের স্বেচ্ছামূলক প্রয়োগ, যা কেবল জণকল্যাণের চাহিদার বিষয় নয় বরং পাপের সহঘটিত ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। Godwin-এর শাস্তি সম্পর্কীয় সংজ্ঞায়নকে যদি স্বীকার করে নেয়া হয়, তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে শাস্তি কেবল ক্ষতিপূরণের নিমিত্তে হতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যেমন: প্রতিকার, প্রতিরোধ, সংশোধন কিংবা সামাজিক নিরপত্তাজনিত ইত্যাদি হলে তা শাস্তি বিবেচিত হবে না। কেননা এসকল প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ নিরাপদ অবস্থা তৈরি হতে পারে, এ বিষয়টি বিবেচিত হয়। তবে শাস্তির ধারণার এমন সীমাবদ্ধতার বিপরীতে ব্রিটিশ দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ Rashdall-এর সুন্দর একটি যুক্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে:

> When a man is punished in the interest of society, he is indeed treated as a means, but his right to be treated as an end is not thereby violated, if his good is treated as of equal importance with the end of other human beings.[৪]

অর্থাৎ শাস্তির ক্ষেত্রে সামাজিক কল্যাণের অংশ হিসেবে ব্যক্তির কল্যাণ স্বীকৃত হলে ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষিত হয়। এটি শাস্তি সম্পর্কে এক ধরনের যৌক্তিকতা প্রদান করে। কেননা এ স্বীকৃতি কল্যাণ কামনায় ব্যক্তির কল্যাণও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে। কারণ শাস্তি প্রদানের বিষয়টি কেবল সমাজের অধিকারই নয়, এটি সমাজের দায়িত্বও বটে। জার্মান দার্শনিক G.W.F. Hegel বলেন, শাস্তি যৌক্তিক প্রাণী হিসেবে মানুষের মূল্যায়ন

করে, যা মানুষের জন্য সঠিক তাই করে।[৫] দার্শনিক H.L.A Hart তাঁর *'Prolegomenon to the Principles of Punishment'* প্রবন্ধে শাস্তির সংজ্ঞায় বলেন, শাস্তির ধারণার পাঁচটি উপাদান রয়েছে : এক. এটি এমন যন্ত্রণা বা পরিণতি, যা সাধারণত অপ্রীতিকর হিসেবে বিবেচিত হবে; দুই. এটি অবশ্যই আইনি বিধিগুলোর বিরুদ্ধে একটি অপরাধ হতে হবে; তিন. এটি অবশ্যই তার বিপরীতে অপরাধের জন্য প্রকৃত বা অনুমিত অপরাধী হতে হবে; চার. এটি অবশ্যই অপরাধী ব্যতীত অন্য মানুষ দ্বারা বাস্তবায়িত বা পরিচালিত হতে হবে; এবং পাঁচ. এটি অবশ্যই আইনি ব্যবস্থার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এমন কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিচালিত এবং প্রযুক্ত হতে হবে, যার বিরুদ্ধে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে।[৬]

আবার কিছু সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে শাস্তি হলো সামাজিক মূল্যবোধের অবমূল্যায়ন বা সামাজিক আইন ভঙ্গের কারণে সমাজের প্রথাগত অপমানকর প্রতিক্রিয়া, যেখানে সামাজিক মৌলিক মূল্যবোধের প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক সংহতির উন্নয়ন ঘটে। আবার প্রগতিশীল চিন্তাবিদগণ মনে করেন, শাস্তি হলো দরিদ্র্যের প্রতি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী শ্রেণির আরোপিত একটি ব্যবস্থা। শ্রেণিবৈষম্য যত বেশি, শাস্তির প্রয়োগ দরিদ্র শ্রেণির প্রতি তত বেশি। এটি মূলত ধনিক শ্রেণির শোষণ ও সুবিধাভোগের হাতিয়ার। তবে আবার কারো কারো মতে, অপরাধ অন্যান্য অসুস্থতা বা রোগের মতো একরকম অসুস্থতা বা রোগ, যা অন্যান্য অসুস্থতার মতো চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময় সম্ভব। শাস্তি বা যন্ত্রণা প্রয়োগের মাধ্যমে নয়।[৭]

শাস্তির ধারণাটি একটু গোলমেলে। সে কারণে এ বিষয়টির সংজ্ঞায়নও দূরূহ। তবে সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, একদিকে শাস্তি হলো ব্যক্তির কৃতকর্মের একরকম প্রতিক্রিয়া, যা একরকম হানি বা ক্ষতি। অপরাধীর কাছে যা কিছু মূল্যবান, যেমন: স্বাধীনতা, অর্থ (যখন তাকে জরিমানা করা হয়) ইত্যাদি তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া বা কেড়ে নেওয়া।[৮] আবার অন্যদিকে শাস্তি হলো মানুষের নেতিবাচক আচরণ (সমাজ কিংবা রাষ্ট্রীয় বিধি-বহির্ভূত আচরণ) নিয়ন্ত্রণ করার নিমিত্তে সমাজ বা রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত এক ধরনের ব্যবস্থা, যা রাষ্ট্র ব্যক্তিক বা সামষ্টিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে আরোপ করে থাকে। মোটকথা রাষ্ট্র কর্তৃক মানুষের নৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করার একটি মাধ্যম হলো শাস্তি। এটি নৈতিকভাবে মন্দ কাজের জন্যও হতে পারে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নৈতিকভাবে মন্দ না হলেও রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনবিরোধী কাজের জন্য আরোপিত হতে পারে। যেমন: এমন কোনো ব্যক্তির উপর আরোপিত অপ্রীতিকর

আচরণ, যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় কর সংক্রান্ত মন্দ নীতির কারণে কর প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায়।[৯]

অপরাধের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার কারণে শাস্তির প্রকৃতি ও ধরনের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। তবে অপরাধের ধরন ও গুরুত্ব বিচারে চরম প্রকৃতির শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড, যে বিষয়ে মানব ইতিহাসের একেবারে গোড়া থেকে নানা বিতর্ক আজও বহমান। তাছাড়া মানব সভ্যতায় মৃত্যুদণ্ডের ইতিহাস প্রাচীন। আদিম সমাজে অপরাধকে বিবেচনা করা হতো দেবতা বা পূর্বপুরুষের আত্মার অপমান বা অবমূল্যায়ন হিসেবে। তারা এটি বিশ্বাস করতেন যে যদি অপরাধীকে শাস্তি না দেয়া হয়, তাহলে দেবতা বা ওইসমস্ত আত্মা তাদের বিপদ নিয়ে আসবে। হাম্মুরাবির আইন[১০], যা কিনা অস্তিত্বশীল প্রাচীনতম আইনের মধ্যে অন্যতম, সেখানেও লক্ষ করা যায় যে কিছু অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির বিধান ছিল। যেমন: ব্যাভিচার, কুবচন, জনসম্মুখে মহিলাদের মদপান, চুরি ইত্যাদি।[১১]

আদিম সমাজে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের প্রয়োগ বেশি ছিল। অতীতে হত্যা ছাড়াও যৌনাচার, প্রচলিত মতের বিরুদ্ধাচারণ, ধর্মীয় কারণ, প্রভৃতি কারণে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল। আর মৃত্যুদণ্ড নানাভাবে বাস্তবায়ন বা প্রয়োগ করা হতো। যথা: ফাঁসিতে ঝুলিয়ে, শিরশ্ছেদ করে, ক্রুসবিদ্ধ করে, পুড়িয়ে, পানিতে ডুবিয়ে, গুলি করে, বৈদ্যুতিক শক দিয়ে, অঙ্গচ্ছেদ করে প্রভৃতি। এগুলোর কোনো কোনোটি আবার ছিল খুবই অমানবিক। প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যে ও মধ্যযুগে অনেক অমানবিক জঘন্য মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে জানা যায়। আধুনিক সমাজে অনেক দেশেই মৃত্যুদণ্ডের বিধান ও প্রকৃতি শিথিল করা হয়েছে। যে সমস্ত দেশে এরূপ ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানেও আবার তা জনসম্মুখে না করে গোপনীয়তার সাথে বাস্তবায়ন করা হয়।[১২]

(২)

শাস্তির ধারণাটি অন্যের প্রতি উদ্দেশ্যমূলক আঘাত করার ধারণার সাথে সংশ্লিষ্ট। যেহেতু উদ্দেশ্যমূলক আঘাত অন্যায়, সেহেতু শাস্তির ধারণাটি কিছুটা সমস্যাপূর্ণ। শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শক্তিশালী যুক্তির প্রয়োজন, আর মৃত্যুদণ্ডের মতো শাস্তির ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য যুক্তির প্রয়োজনীয়তা আরো বিশেষ। ঐতিহাসিকভাবে বিখ্যাত ও প্রকৃত মৃত্যুদণ্ড নানা বিতর্কের তৈরি করেছে। যেমন প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ঈশ্বর না মানা ও তরুণ সমাজকে বিপথে পরিচালিত করার জন্য সক্রেটিসকে বিষপানে মৃত্যুদণ্ড প্রদান, ১৯৭৭ সালে সৌদি আরবের এক রাজকুমারী ও তাঁর প্রেমিককে ব্যভিচারের অপরাধে যথাক্রমে গুলি করে ও শিরশ্ছেদ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় প্রভৃতি।[১৩]

মৃত্যুদণ্ডের ধারণাটি দুটি দিক বা যুক্তি থেকে মূল্যায়িত হয়। একটি ন্যায়বিচারের ধারণা, অন্যটি প্রতিরোধের ধারণা। ন্যায়বিচারের বা ন্যায়পরায়নতার ধারণা বা যুক্তির ক্ষেত্রে বলা হয় যে কিছু মারাত্মক অপরাধের বিপরীতে মৃত্যুদণ্ড কাম্য। ব্যক্তি তার অপরাধের সমুচিত প্রতিদান বা কর্মের মূল্য পরিশোধ বিবেচনায় মৃত্যুদণ্ড ভোগ করবে। তবে এখানে যদি পরিশোধের কথা বলা হয়, তবে পরিশোধ বলতে কী বোঝায় বা পরিশোধের বিষয়টি কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, সে বিষয়ে বিতর্ক রয়েছে। কেননা এখানে 'পরিশোধ' অর্থ 'সাধারণ ঋণ পরিশোধ' নয়। আবার সমুচিত প্রতিদানের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে বলে আমি তোমাকে সমুচিত প্রতিদান দিবে, সেক্ষেত্রে সমুচিত প্রতিদান অপরকে ভোগানো অর্থে এক ধরনের প্রতিশোধপরায়ণতা বা প্রতিহিংসার সৃষ্টি করে, যা নৈতিক বা আইনি কোনোভাবেই কাম্য নয়। তবে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োগকৃত শাস্তির ক্ষেত্রে বলা হয়, তা রাষ্ট্রীয় আদেশ হয়ে থাকে এবং তা ব্যক্তিগত বিবাদ এবং ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা এড়ানো বা পরিহার করার জন্যই প্রয়োগ হয়ে থাকে। সভ্য সমাজে রাষ্ট্রের প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসার কোনো অভিপ্রায় থাকে না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলো আইন শৃঙ্খলা রক্ষা ও এর সঠিক বাস্তবায়নে সহায়তা করা এবং রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে বেআইনি আক্রমণ থেকে রক্ষা করা।[১৪]

মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে আরো একটি পরিচিত যুক্তি হলো প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে শাস্তি। এক্ষেত্রে অপরাধী এবং সম্ভাব্য অপরাধীকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে মৃত্যুদণ্ড প্রয়োজন। এ ধরনের যুক্তির ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক তথ্যের কার্যকারিতার কথা বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে এ সকল পরিসংখ্যান ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক তথ্য অভিন্ন ও স্পষ্ট নয়। আবার ব্যক্তি শাস্তির ভয়েই অপরাধ করা থেকে বিরত থাকবে বা শাস্তির ভয়েই অপরাধ করা থেকে বিরত থাকলে বা শাস্তির বিষয় বিবেচনায় নিয়ে অপরাধ করা থেকে বিরত থাকবে অথবা এরূপ অবস্থায় থেকে যদি মারাত্মক কিছু ঘটে, তবে তাকে হত্যা বলা যাবে, এ বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা যায় না।[১৫] উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, দুজন লোক মাতাল অবস্থায় পরস্পর তর্কে লিপ্ত হলো এবং তাদের মধ্যে একজন তার কাছে থাকা পিস্তল দিয়ে অপরজনকে গুলি করল, যার কারণে তার মৃত্যু হলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে– এক. এই মৃত্যুকে কী হত্যা বলা যাবে? দুই. ব্যক্তি কি শাস্তির বিষয়টি সম্পর্কে জেনেই হত্যা করেছে? তিন. ব্যক্তি কি সে অবস্থায় শাস্তির বিষয় বিবেচনায় নিয়ে হত্যা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারত? আবার অনেকের কাছে স্বাধীনতা মানে হলো নিরবিচ্ছিন্ন বেঁচে থাকার অধিকার। হয়তো হত্যাকে অন্যায় বিবেচনা করার এটাই একমাত্র যুক্তি বা অনেকগুলো যুক্তির একটি যুক্তি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাহলে হত্যাকারীর বেঁচে

থাকার অধিকার কী? যদি বেঁচে থাকার অধিকার মানুষের মৌলিক মানবাধিকার হয়, তবে হত্যাকারীরও সে অধিকার রয়েছে। সে তো তার সে অধিকার ত্যাগ করেনি। কাজেই যে যুক্তিতে হত্যাকে অন্যায় বা মৌলিক মানবাধিকারের লংঘন বলা যায়, সেই একই যুক্তিতে হত্যার অপরাধে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড বা হত্যা করাও তো মানবাধিকারের লঙ্ঘন। আর এমন শাস্তিও সেক্ষেত্রে অন্যায় বিবেচিত হতে পারে।[১৬] তাহলে প্রশ্ন হলো নৈতিকভাবে মৃত্যুদণ্ডের সমর্থনের কোনো অবস্থান আছে কি?

কাজেই লক্ষণীয় যে, ঐতিহাসিকভাবে প্রচলিত, বাস্তবায়িত কিন্তু অত্যন্ত বিতর্কিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হলো মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টি একটি জটিল নৈতিক সমস্যা। কেননা বিষয়টির পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় ক্ষেত্রেই বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি রয়েছে। মৃত্যুদণ্ডের পক্ষের যুক্তি আলোচনায় মনে হয়, মৃত্যুদণ্ড সঠিক ও গ্রহণযোগ্য, আবার বিপক্ষের যুক্তির আলোচনায় মনে হয়, মৃত্যদণ্ড কোনো সঠিক ও যথার্থ মানদণ্ড নয়।[১৭] প্রবন্ধের এ পর্যায়ে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষ-বিপক্ষ সমর্থনকারীদের যুক্তি ও সেগুলোর গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য দিক পর্যালোচনা করে এ বিতর্কের সমাধানে একটি উপায় তুলে ধরার প্রচেষ্টা করব। প্রথমেই মৃত্যুদণ্ডের বিপক্ষ চিন্তাবিদদের মত উল্লেখ করছি। শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের গ্রহণযোগ্যতার বিপরীতে অবস্থানকারী চিন্তাবিদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: Arthur Koestler, Bedua, Radelet, Edward Heath, Stephen Nathanson, David Conway প্রমুখ। প্রত্যেকে স্ব স্ব অবস্থান থেকে নানা যুক্তিতে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করেন।

ঔপন্যাসিক ও সামাজিক সমালোচক Arthur Koestler মৃত্যুদণ্ড উচ্ছেদ বা বাতিলের পক্ষে মত দেন। তিনি মনে করেন, মৃত্যুদণ্ড কোনো কার্যকারী উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না এবং এর কোন প্রতিরোধ বা প্রতিকারমূলক প্রভাব নেই। Koestler বলেন, মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে গতানুগতিক তিনটি যুক্তি লক্ষ করা যায়: এক. মৃত্যুদণ্ডের স্বতন্ত্র প্রতিরোধ মূল্য রয়েছে; দুই. মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে সর্বাধিক সন্তোষজনক কোনো বিকল্প নেই এবং তিন. মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে জনসমর্থন রয়েছে। তিনি উপযোগবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম যুক্তিটি খণ্ডন করেন এবং মনে করেন, প্রথম যুক্তির খণ্ডন অবশিষ্ট যুক্তিগুলোর গ্রহণযোগ্যতা হারায়। তিনি প্রতিরোধের স্বতন্ত্র মূল্যের বিপরীতে বলেন, স্বভাবতই প্রতিরোধ যৌক্তিকভাবে প্রতিরোধীর প্রতি হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে: এক. কে বা কারা সেই প্রাকল্পিক প্রতিরোধী, যাদেরকে বা যাকে প্রতিরোধ করা হবে, যাদেরকে বা যাকে দীর্ঘ কারাদণ্ড না দিয়ে কেবল মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হবে? দুই. অবশ্যই

মৃত্যুদণ্ড একটি শক্তিশালী প্রতিরোধক, কিন্তু দীর্ঘ বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের চাইতে এটি কতটা শক্তিশালী?

আবার প্রতিরোধের স্বতন্ত্র মূল্য বা কার্যকারিতার কথা যদি বলা হয়, তবে দেখা যায় যে সকল রকমের হত্যা বা হত্যাকারীর ক্ষেত্রে এটি কার্যকর নয়। যেমন যেসব হত্যাকারী হত্যার পর চাপ সইতে না পেরে আত্মহত্যা করে তাদের ক্ষেত্রে, পাগল বা মানসিক বিকারগ্রস্ত হত্যাকারী, ঝগড়ার মধ্যে যারা হত্যা করে বসে, নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সংঘটিত হত্যা, হঠাৎ আবেগের বশবর্তী হয়ে করা হত্যার ক্ষেত্রে এটি কার্যকর নয়। আবার যেসব হত্যাকারী মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টি জেনেও শাস্তির নিয়ম স্বীকার করে হত্যা করে, বা যারা হত্যার ক্ষেত্রে এটা মনে করে যে হত্যায় তার পদ্ধতি উত্তম যেটি ধরা পড়বে না, সেসকল অপরাধীর ক্ষেত্রে এটি মোটেই কার্যকর নয়।[১৮]

সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী Edward Heath মনে করেন, মৃত্যুদণ্ড নৈতিকভাবে অসমর্থিত বা অগ্রহণযোগ্য এক রকম প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা। তিনি বলেন, মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে অনেক সমর্থনকারী এটাই মনে করেন যে মৃত্যুদণ্ড যদি প্রতিরোধ করতে নাও পারে, তবুও অপরাধীর মৃত্যুই প্রাপ্য। কিন্তু এটি একদিকে যেমন প্রতিশোধের প্রশ্ন, অন্যদিকে আমাদের সকলের কাছে নৈতিক বিবেচনার বিষয়। তিনি বলেন, "আমি প্রতিশোধে বিশ্বাসী নই। যদি এমন হয় যে আমি সন্ত্রাসের শিকার, তারপরও যে কোনো প্রকারে প্রতিশোধ হিসেবে আমি তাদের মৃত্যুদণ্ড কামনা করব না। কেননা এটি সমাজে ঘটে যাওয়া মন্দের গভীরতা বাড়ানো ছাড়া আর কিছু করবে না"।[১৯] তাঁর মতে, মৃত্যুদণ্ড নৈতিক নিয়মের লঙ্ঘন হিসেবে সমর্থনযোগ্য নয়। নৈতিক আইন হলো এমন কতকগুলো নিয়ম, যেগুলো নির্দিষ্ট করে কোন ধরনের কাজ সঠিক, আর কোন ধরনের আচরণ সঠিক নয়। নৈতিক আইন সব সময়ই হত্যা অর্থাৎ ঐচ্ছিক হত্যাকে অন্যায় হিসেবে বিবেচনা করে। মৃত্যুদণ্ড নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এক ধরনের হত্যা, নৈতিক আইনের লঙ্ঘন হিসেবে সবসময়ই সঠিক নয় এবং নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়।[২০]

ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ দার্শনিক, আইনবিদ, বিচারক ও লেখক James Fitjames Stephen মনে করেন যে শাস্তি এক ধরনের প্রতিহিংসাকে সমর্থন করে এবং এক ধরনের ঘৃণার অনুমোদন দান করে থাকে। তিনি বলেন, অসন্তোষ, প্রতিশোধ একধরনের বোধ তৈরি করতে পারে, যাতে মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নিতে পারে এবং তা একটি নৈরাজ্যমূলক অবস্থা তৈরি করতে পারে।[২১] শাস্তি প্রতিশোধ নয়, কেননা শাস্তির ক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যায়ন বা সমর্থনের প্রয়োজন হয় যেমনটি আমেরিকান সাংবাদিক

Mike Royko বলেছেন। তিনি বলেন, শাস্তির নৈতিক মূল্যায়ন হলো এটি প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ নয়, বরং এটি হলো শাস্তি পাবার যোগ্যতা। প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধের ক্ষেত্রে কারো প্রতি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আচরণ করা হয়।[২২] কিন্তু শাস্তি হলো অপরাধীর অপরাধের ভয়াবহতার ভিত্তিতে তার প্রতি তার প্রাপ্য আচরণ। এখানে প্রতিহিংসা নয়, বরং ন্যায্যতার বিষয়টিই উদ্দেশ্য, যার মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে একটি স্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়।

মৃত্যুদণ্ডের আরেকটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হলো, এটি প্রকৃতিগতভাবে অপরিবর্তনীয়, যেখানে ক্ষতিপূরণের কোনো সুযোগ নেই। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সাবেক সদস্য John Maxton বলেন, অস্বাভাবিক ক্ষতির যুক্তিতে মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টিকে সমর্থন করা যায় না।[২৩] তাঁর মতে, মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে হত্যার ন্যায় অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে। আবার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর বিচারিক প্রক্রিয়া দীর্ঘ হলে তার কারণেও ব্যক্তিকে অসহনীয়, অবর্ণনীয় ও অমানবিক কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, যা কোনোভাবে কাম্য নয় বা কোনোকিছুতেই তা পূরণীয় নয়। এতে ব্যক্তি দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করে। আর মৃত্যুযন্ত্রণা কখনই হ্রাস করা যায় না এবং এটির কামনাও স্বাভাবিক নয়। কাজেই মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করা যায় না। এটি সঠিক ব্যবস্থা নয়।[২৪]

চরম শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধীতাকারী আমেরিকার নর্থ ইস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Stephen Nathanson তাঁর *The Immortality of Punishing by Death* (2nd ed., 2001) গ্রন্থে বলেন, মৃত্যুদণ্ড অন্যায় ও অনৈতিক। যদিও আমরা কিছু শাশ্বত এবং অমীমাংসিত বিষয়ের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডকে অপরিহার্য মনে করি, কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টিকে বস্তুগত ও নৈতিক কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না। যদিও এটি সাধারণ যে মত্যুদণ্ডের পক্ষে বিপক্ষে উভয় যুক্তির ভিত্তি ন্যায়পরায়ণতা ও মানবজীবনের মূল্য, তবুও মৃত্যুদণ্ডকে যৌক্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না। তিনি বলেন, মৃত্যুদণ্ডকে একটি তত্ত্ব হিসেবে যৌক্তিক মনে হলেও প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এটি নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়।[২৫] যদি মৃত্যুদণ্ডকে তত্ত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে এর পক্ষে দুটি যুক্তি লক্ষ করা যায়। প্রথমত, এটি সম্ভাব্য হত্যাকারীকে প্রতিরোধ করার মাধ্যমে নিরপরাধ প্রাণ রক্ষা করে। দ্বিতীয়ত, ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্রে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ডই কাম্য। Nathanson এ দুটি যুক্তিকে খণ্ডন করেন। প্রথমত, তিনি বলেন, সম্ভাব্য অপরাধীকে প্রতিরোধ করার জন্য শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডই শ্রেষ্ঠ প্রতিরোধক, এ নিশ্চয়তা নেই। আবার এটি যথার্থ প্রতিরোধক হলেও নৈতিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ। তিনি বলেন নৈতিকতার সাধারণ জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি যেমন, আত্মরক্ষার কারণে

হত্যার যৌক্তিকতা সমাজের আত্মরক্ষা হিসেবে মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করে। কিন্তু যদি প্রতিরোধমূল্যই গুরুত্বপূর্ণ হয়, তবে এমন শাস্তির কথা চিন্তা করা যায়, যা অপরাধীর মৃত্যুদণ্ডের বাস্তবায়ন বা কারাদণ্ডের চাইতে অধিক কার্যকরী। কিন্তু তার প্রয়োগ অন্যায়। যেমন, সম্ভাব্য অপরাধী বা হত্যাকারীকে প্রতিরোধ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে হত্যাকারীর পরিবর্তে যদি তার আত্মীয়-স্বজন বা পরিবারকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায়, তবে তা অধিক কার্যকর হয়। কেননা হত্যাকারী তার নিরপরাধ পরিবারের শাস্তি মেনে নিতে পারবে না। এতে করে সম্ভাব্য অপরাধীকে অধিকহারে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের প্রতিরোধমূল্য অধিক হলেও নৈতিকভাবে তা সমর্থনযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, ন্যায়পরায়ণতার যুক্তি, যেটি মূলত "চোখের বদলে চোখ" নীতির প্রকাশ। এ নীতি অনুযায়ী অপরাধীর শাস্তি কাম্য এবং সে তার অপরাধের মাত্রানুযায়ী শাস্তি ভোগ করবে। এমন নীতির ক্ষেত্রে তিন ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়: এক. এ নীতি অমানবিক এবং বর্বরোচিত শাস্তির অনুমোদন দেয়; দুই. এ নীতি শাস্তি সম্পর্কিত অন্যান্য বিশ্বাস এবং যুক্তির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ; তিন. এ নীতি অপরাধের মাত্রানুযায়ী শাস্তির প্রকৃতি নির্ধারণে অনেকক্ষেত্রে যথার্থ নির্দেশনা দেয় না।

সুতরাং তাঁর মতে, মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে "চোখের বদলে চোখ" নীতি এবং প্রতিরোধমূল্য উভয়ই অপর্যাপ্ত এবং নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। কিছু বিমূর্ত ধারণা যথা: নৈতিকতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সমাজ ও তার প্রতিষ্ঠান এসবের উপর মৃত্যুদণ্ডের মূল্যায়নের বিষয়টি নির্ভরশীল। মৃত্যুদণ্ডের সমর্থনে যে দুটি মূল্যবোধ যথা: ন্যায়পরায়ণতা এবং মানবজীবনের মূল্য-র কথা বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে এ বিধানের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান প্রাকারান্তরে এ দুটি মূল্যবোধের লঙ্ঘন করে।[২৬]

ব্রিটিশ দার্শনিক David Conway একইভাবে শাস্তির ভয়াবহ পরিণতির ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ডের অধিক প্রতিরোধে সক্ষম হওয়ার যুক্তিকে অস্বীকার করে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, একটি শাস্তির তুলনায় অন্য শাস্তির ভয়াবহতা এটা নিশ্চিত করে না যে ভয়াবহ শাস্তি কম ভয়াবহ শাস্তির তুলনায় বেশি প্রতিরোধক। তিনি বলেন, যদি আমাকে কোনো একটি (মৃত্যুদণ্ড এবং একশত বছর বা চিরকাল নরকে থাকার মধ্যে) বেছে নিতে বলা হয়, তবে আমি চিরকাল নরকে থাকার বিষয়টিকে সমর্থন করব। কেননা এটিই আমাকে প্রতিরোধ করার জন্য যথেষ্ট। মৃত্যুদণ্ড ভয়াবহ, কিন্তু আজীবন কারাবাসের তুলনায় এটি অধিক প্রতিরোধক নয়।[২৭] Conway-এর মতো একই মত পোষণ করেন Hugo Adam Bedua এবং Jeffrey Reiman। তাঁরা মনে করেন, দীর্ঘকালীন কারাদণ্ড হত্যাকারীর জন্য প্রতিশোধমূলক প্রতিক্রিয়া এবং মৃত্যুদণ্ডের প্রতিরোধমূলক

প্রভাব নেই। Reiman আরো বলেন, মৃত্যুদণ্ডের বিলোপ সমাজের উপর সভ্য প্রভাব ফেলবে।[২৮] অন্যদিকে অধ্যাপক David Dolinko সমস্ত মানুষের সত্য-অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্ত পদ্ধতির অনিবার্য অপূর্ণতা তুলে ধরে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রেও এমন ভুলের অনিবার্যতাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।[২৯] আবার সুইডিশ-আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক অপরাধবিজ্ঞানের পথিকৃৎ John Thorsten Selin বলেন, দীর্ঘকালীন কারাদণ্ডের চেয়ে মৃত্যুদণ্ড অধিক প্রতিরোধ গুণসম্পন্ন নয়।[৩০] সুতরাং উল্লিখিত সকলের আলোচনা থেকে এটি বলা যায় যে চরম শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের অমানবিকতা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, প্রভৃতি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য, এটির অপরিবর্তনশীল প্রকৃতি এবং শাস্তির যথার্থ উদ্দেশ্য পূরণে সন্তোষজনক প্রমাণ না থাকার কারণে এটিকে সমর্থন করা যায় না, বা এটি গ্রহণযোগ্য কোনো মানবিক ব্যবস্থা নয়।

(৩)

একটি প্রাচীন মত, যা পরবর্তীকালে মূল ধারার দার্শনিকবৃন্দ: Plato থেকে Thomas Aquinas, Thomas Hobbes থেকে Immanuel Kant, Thomas Jefferson, John Stuart Mill এবং C.S. Lewis প্রভৃতি দার্শনিক দ্বারাও অনুমোদিত যে হত্যার যথাযথ শাস্তি হলো হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড। এই প্রচলিত মতের একটি দিক হলো প্রতিক্রিয়াশীল বা কর্তব্যতত্ত্বের দিক, যার সংক্ষিপ্তসার লক্ষ করা যায় Aquinas এবং Kant-এর মতে। তাঁরা মনে করেন, বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা হিসেবে মানুষের মর্যাদা আছে। কেউ যদি পূর্ব পরিকল্পিতভাবে অন্যকে হত্যা করে, অন্যের বেঁচে থাকার অধিকার হরণ করে, তবে তার মৃত্যুদণ্ডই প্রাপ্য। এ ধারার আরেকটি দিক হলো দূরদর্শী বা পরিণামবাদী মত, যা উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করেন ব্রিটিশ উপযোগবাদী দার্শনিক Jeremy Bentham, John Stuart Mill এবং Ernest Van dan Haag। তাঁরা মনে করেন, শাস্তির উদ্দেশ্য প্রতিরোধ হওয়া উচিত এবং মৃত্যুদণ্ড সম্ভাব্য হত্যাকারীদের জন্য যথার্থ প্রতিরোধক।[৩১]

মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে যাঁরা শক্ত যৌক্তিক অবস্থান নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন মনোবিশ্লেষক এবং দার্শনিক Ernest Van dan Haag । তিনি ন্যায্যতার ধারণার ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ডের ধারণার সমালোচনার বিরোধিতা করেন। তিনি শাস্তির উদ্দেশ্য ধারণার ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে অন্যায্যতার যুক্তি খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, মৃত্যুদণ্ডকে অন্যায্য মনে করা হয় এ কারণে যে মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে নিরপরাধীর প্রাণ যেতে পারে অথবা ধনী অপরাধী দরিদ্র অপরাধীর তুলনায় বেশি সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে বা দরিদ্র অপরাধীর তুলনামূলকভাবে বেশি প্রাণহানী ঘটতে পারে। এ অভিযোগগুলো প্রাসঙ্গিক হতে

পারে যদি কেউ মনে করে যে শাস্তির উদ্দেশ্য ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। আবার যদি কেউ এটা মনে করে যে শাস্তি কল্যাণকর। নিরপরাধীর চেয়ে অপরাধী শাস্তি পাওয়া ভালো বা অপরাধী তার অপরাধের সমপরিমাণ শাস্তি পাবে বা শাস্তি স্বতঃমূল্যে ভালো। তবে যাই হোক, এ ভাবনাগুলো শাস্তির উদ্দেশ্য যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা, তারই বহিঃপ্রকাশ। তবে সেক্ষেত্রে ন্যায়পরতার ধারণা থেকে যে কোনো ধরনের শাস্তি এমনকি মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে এক ধরনের ভিত্তি তৈরি হয়। তবে শাস্তির মাধ্যমে অন্যায় হবার সম্ভাবনার অভিযোগের ভিত্তিতে যারা মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা করেন, তারা কেবল শাস্তির গুরুত্বই নয়, শাস্তির মাধ্যমে যে ন্যায় হতে পারে, এ বিষয়টিকে বা শাস্তির এমন উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করেন। যদি ন্যায় শাস্তির একটি উদ্দেশ্য হয়, তবে অন্যায় হওয়া মৃত্যুদণ্ড বা অন্য কোনো ধরনের শাস্তির পক্ষে কোনো আপত্তি হতে পারে না। আবার মৃত্যুদণ্ডের পক্ষের যুক্তিকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এখন অন্যায়ের অভিযোগের বিষয়টি যদি বিবেচনা করি, তবে দেখা যায় একজন অভিযুক্ত পরবর্তী পর্যায়ে নিরপরাধী প্রমাণিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে যদি তার ফাঁসি হয়, তবে সে শাস্তি আর পরিবর্তন করা যাবে না। আবার যদি সে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তবে পরবর্তী পর্যায়ে নির্দোষ প্রমাণিত হলেও যে সময়টুকু সে কারাগারে ছিল, তা ফিরিয়ে দেয়া যাবে না। তবে নির্দোষ প্রমাণিত হবার পর এক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে তা হলো, তার কারাদণ্ডের সময় বাতিল করা যেতে পারে বা কমিয়ে দেয়া যেতে পারে এবং তাকে কিছু ক্ষতিপূরণ দেয়া যেতে পারে। তবে ইতোমধ্যে যে ক্ষতি হয়েছে, তাকে আর তার বিপরীত অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। লক্ষণীয় বিভিন্ন ধরনের শাস্তির মধ্যে অর্থদণ্ড বা জরিমানা হলে তা পরিবর্তন করা যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শাস্তির প্রকৃতিগত দিক থেকে জরিমানা বা অর্থদণ্ড ছাড়া অন্য যে কোনো ধরনের শাস্তি অপরিবর্তনীয়। সেক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের বিষয়টিও অপরিবর্তনীয়।[৩২]

Ernest Van den Haag মৃত্যুদণ্ডের যৌক্তিকতা ব্যাখার ক্ষেত্রে একটি নতুন যুক্তির ব্যাখ্যা প্রদান করেন। আর তা হলো *Best Bet Argument* বা সর্বোচ্চ বাজির যুক্তি। তিনি বলেন, আমাদের অজ্ঞতার কারণে সামাজিক নীতি এক ধরনের বাজির মতো। তিনি বলেন, আমরা যা ঘটতে দেই, যা করি এবং যা করা থেকে বিরত থাকি বা করা বর্জন করি, তার জন্য আমরা দায়বদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যদি কেউ তার সন্তানকে সঠিকভাবে লালন-পালন করতে না পারে, আর সে সন্তান যদি সমাজের জন্য ভয়ানক হয়, তবে তার মন্দ আচরণের দায় তার পিতামাতার উপরও কিছুটা থাকে। কেননা তাঁরা হয়তো তাকে সঠিক আচরণের শিক্ষা দিতে পারতেন। আবার কোনো ক্ষেত্রে

এমন ছোট মন্দ কাজ, যা ভবিষ্যতে আরো ভয়াবহ মন্দে পরিণত হতে পারে, তাকে যদি আমরা শুরুতে প্রতিহত না করি তবুও তার দায় আমাদের নিতে হবে। এখন যদি আমরা মনে করি যে মৃত্যুদণ্ড নিরপরাধ মানুষকে রক্ষা ও সম্ভাব্য অপরাধীর অপরাধ প্রতিরোধ করতে পারে, তবে আমাদের মৃত্যুদণ্ড সমর্থনের বিষয়টি দাঁড়ায় নিরপরাধ মানুষের পক্ষে এবং হত্যাকারীর বিপক্ষে বাজি। এর বিপরীত যদি হয়, তবে তা হবে অপরাধীর পক্ষে এবং নিরপরাধীর বিপক্ষে বাজি। এক্ষেত্রে যদি প্রথম বাজি ব্যর্থ হয়, তবে আমরা মনে করতে পারি যে এ নীতির মাধ্যমে কিছু মানুষের প্রাণহরণ হয়েছে এবং আমরা এ নীতি থেকে ফিরে আসতে পারি। আর যদি দ্বিতীয় বাজি ব্যর্থ হয়, তবে আমরা নিরপরাধের প্রাণরক্ষার সুযোগ নষ্ট করেছি। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো এ ধরনের নীতির ক্ষেত্রে কার জীবন বেশি গুরুত্বপূর্ণ, অপরাধীর না কি নিরপরাধী ও সম্ভাব্য অপরাধীর, সেটি অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। তবে বলা যায়, অবশ্যই নিরপরাধীর প্রাণ অপরাধীর তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং নিরপরাধীর প্রাণরক্ষার জন্য কার্যকরী নীতি গ্রহণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।[৩৩]

আমেরিকান ইতিহাসবিদ Hentoff জনসাধারণের নিজেদের দায়িত্ব নেবার স্বার্থে জনসম্মুখে মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করেন। আবার মানুষের আচরণের উপযোগবাদী প্রবণতার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে Wilson and Herrnstein যুক্তি প্রদান করেন যে একটি বিশাল পরিমাণ অপরাধ সংঘটিত হয় লাভ-ক্ষতির বিশ্লেষণের পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে। অপরাধী অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধ করার পূর্বে তার ধরা পড়ার এবং শাস্তি পাবার ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে। অপরাধী যদি মনে করে যে তার অপরাধের শাস্তি কঠোর নয় কোমল, তবে সে অপরাধের প্রতি ভীতিহীন ও আকর্ষণীয় অনুভব করবে। মার্কিন দার্শনিক Louis Pojman এ মতকে সমর্থন করে বলেন যে কারাদণ্ড যে দাবি করে তা হলো ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করা, কিন্তু মৃত্যুদণ্ড তার চেয়ে বড় ও বেশি ক্ষতি করে, তা হলো বেঁচে থাকার সুযোগ নষ্ট করা। কারাভোগের মাধ্যমে অপরাধী সীমিত স্বাধীনতার দ্বারা আত্মসংযমী আচরণ করতে পারে। সে অপেক্ষা করতে পারে সেদিনের জন্য, যেদিন তার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার হবে। কিন্তু মৃত্যুদণ্ড এক্ষেত্রে অপরাধীর ভবিষ্যৎ সকল সম্ভাবনাকে নষ্ট করে, যে বিষয়টি তাকে অপরাধ করা থেকে বিরত রাখতে পারে।[৩৪]

ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের এটর্নি Richard Genstein মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে সাধারণ জ্ঞানের দুটি যুক্তির কথা বলেন: এক নিশ্চিতভাবেই মৃত্যুদণ্ড হত্যাকারীকে আরো হত্যা করা থেকে প্রতিরোধ করে; এবং এমনকি তাদেরকেও, যারা কারার মধ্যে বন্দী থেকে অপরাধ করতে পারে; দুই. পরিসংখ্যান আমাদেরকে এটা বলে না যে মৃত্যুদণ্ড কত পরিমাণে সম্ভাব্য

হত্যাকারী বা অপরাধীকে অপরাধ করা থেকে প্রতিরোধ করেছে। এক্ষেত্রে তিনি নিউইয়র্কের বিচারক Hyman Barshay- এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন যে বাতিঘর যেমন সমুদ্রে আলো দেয়, মৃত্যুদণ্ড তেমনই অপরাধীর অপরাধ বা সম্ভাব্য অপরাধীর অপরাধ প্রতিরোধ করে। আমরা জাহাজডুবির ঘটনার কথা শুনলেও এটা শুনি না বা জানি না যে কী পরিমাণ জাহাজকে বাতিঘরের বাতি সঠিক পথ দেখিয়েছে বা সঠিক পথে তাকে ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু তাই বলে আমরা বাতিঘরের গ্রহণযোগ্যতা বা কার্যকারিতা অস্বীকার করি না এবং বাতিঘর বন্ধ করে দেই না। তেমনিভাবে মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে কত অপরাধী এবং সম্ভাব্য অপরাধীর অপরাধ প্রতিরোধ করা হয়েছে, তার পরিসংখ্যানিক তথ্য বা নিশ্চয়তা না থাকার কারণে আমরা মৃত্যুদণ্ডকে উচ্ছেদ করতে পারি না। এমনকি এ ধরনের শাস্তির গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারি না। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে কিছু আপরাধ আবেগের বশবর্তী হয়ে সাময়িক বা স্থায়ী মানসিক বিকার থেকে সংঘটিত হয়ে থাকে, কিন্তু অধিকাংশ অপরাধ সংঘটিত হয় ঝুঁকির বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে। আমরা যদি নাও জানি যে মৃত্যুদণ্ড কী পরিমাণ অপরাধীর অপরাধ প্রতিরোধ করে, তারপরও মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে এ ধরনের সাধারণ বুদ্ধির যুক্তির গুরুত্বকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।[৩৫]

উপযোগবাদী দার্শনিক John Stuart Mill বলেছেন, মৃত্যুদণ্ড সম্ভাব্য অপরাধীর মনে এক ধরনের ছাপ তৈরি করতে পারে। মৃত্যুদণ্ডের প্রতিরোধক প্রভাবে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত প্রমাণ না থাকলেও এটা বলা যায় যে নিয়মিত (প্রয়োজনীয় ও যুক্তিযুক্ত ক্ষেত্রে) এর প্রয়োগ ও প্রচারের একটি কারণিক প্রভাব রয়েছে।[৩৬] Mill -এর মতকে সমর্থন করে Gernstein ব্রিটিশ রয়াল কমিশনের বরাতে বলেন যে সাধারণ মানুষের উপর মৃত্যুদণ্ডের প্রভাব রয়েছে। সম্ভবত মৃত্যুদণ্ডের প্রভাব যতটা হবার কথা, ততটা না হবার কারণ এটির অনিয়মিত বা কদাচিৎ প্রয়োগ। যদি সম্ভাব্য অপরাধী প্রত্যক্ষ করত মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে হত্যার সর্বোচ্চ সম্ভাব্য ফল, তাহলে কি সে অপরাধী এমন ভয়াবহ অপরাধ করত? তিনি আরো বলেন, মানব প্রকৃতির যতটুকু জানা যায়, তার ভিত্তিতে এটি সাধারণ বুদ্ধির যুক্তি যে মৃত্যুদণ্ড অপরাধ প্রতিরোধ করতে পারে। কেননা মানুষ মৃত্যুকে অন্য যে কোনো কিছু থেকে সবচেয়ে ভয় করে। সেক্ষেত্রে বলা যায়, মৃত্যুদণ্ড সবচেয়ে কার্যকরী প্রতিরোধক বা এটির সবচেয়ে কার্যকরী প্রতিরোধ প্রভাব রয়েছে।[৩৭] অন্যদিকে নোবেল বিজয়ী জার্মান বিজ্ঞানী Paul Ehrlich মনে করেন, মৃত্যুদণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ মূল্য রয়েছে।[৩৮] একইভাবে মৃত্যুদণ্ডের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব স্বীকার করে জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের এমিরেটাস অধ্যাপক Igor Primaratz বলেন, নিরপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বাতিল

করার পক্ষে কোনো সন্তোষজনক বা বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি প্রদান করে না।[৩৯] সুতরাং বলা যায়, মৃত্যুদণ্ডের পক্ষের চিন্তাবিদগণ শাস্তির মাধ্যমে সম্ভাব্য অপরাধীর অপরাধ প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ, চরম শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের অধিক প্রতিরোধগুণসম্পন্নতা, শাস্তির অপরিবর্তনীয় প্রকৃতি এবং সর্বোত্তম বিকল্প হিসেবে মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করেন।

(৪)

বাংলাদেশ বর্তমান পৃথিবীর বিস্ময় জাগানিয়া উন্নয়নশীল দেশসমূহের একটি। বাংলাদেশের অগ্রগতি সত্যিকার অর্থেই দৃষ্টান্তমূলক। অর্থনীতি ও আর্থ-সামাজিক অনেক সূচকেই বাংলাদেশের অগ্রগতি দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশকেই ছাড়িয়ে গেছে। তবে পরিতাপের বিষয় এত উন্নয়নের মাঝেও সাম্প্রতিককালে এদেশের মানুষের অপরাধ প্রবণতা যেন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাত্রাকেও ছাড়িয়ে গেছে। সমাজে অপরাধমূলক ঘটনা সংঘটিত হওয়া সমাজ বিকাশের শুরু থেকেই বিদ্যমান। তবে বিভিন্ন সময়ের বিবর্তনে অপরাধের সংখ্যা, মাত্রা এমনকি অপরাধের ধরন বা প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সামাজিক অবস্থাভেদে অপরাধ কখনও কম কখনও বেশি আবার কখনও অত্যধিক সংঘটিত হয় বা হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা, ধরন, মাত্রা অতীতের সকল পরিসংখ্যানকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তাছাড়া বাস্তব প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত বিপুল অপরাধ বিদ্যমান আইন-আদালত, পুলিশ প্রশাসন ও সার্বিক বিচার ব্যবস্থা দ্রুততম সময়ে অপরাধসমূহের সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত বিচার সম্পাদনে যথেষ্ট কার্যকরিতা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি সামাজিক অনুশাসনও কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জনে ব্যর্থ। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এমনকি সাংস্কৃতিক জীবনে অপরাধের ধরন, প্রকৃতি ও মাত্রার নানা পরিবর্তন ও বিবর্তন হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে চুরি, ডাকাতি, খুন, লুণ্ঠন, চোরাকারবারি, চর দখল, ভূমি দখল ইত্যাদি সংক্রান্ত নানা অপরাধ বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ বিধ্বস্ত একটি দেশের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু ৯০-পরবর্তী সময়ে তথ্য-প্রযুক্তির আবির্ভাব, জনসংখ্যা ও বেকারত্ব বৃদ্ধির কারণে অপরাধের ধরনেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আবার একবিংশ শতকে এসে দেখা যায় বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য পাচার, মানি লন্ডারিং, চাঁদাবাজি, খুন, কালোবাজারি, রাজনৈতিক সহিংসতা, সন্ত্রাসবাদ, খাদ্যে ভেজাল ইত্যাদি অপরাধ বেড়ে গিয়েছে। এছাড়াও সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে নারী ও শিশুদের প্রতি নানা সহিংস অপরাধ যেমন: ইভ-টিজিং, ধর্ষণ, খুন, অনৈতিক সম্পর্ক,

পারিবারিক অশান্তিজনিত কারণে শিশুহত্যা, নির্যাতন ও আত্মহত্যা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর হারে সংঘটিত হচ্ছে। বাংলদেশ পুলিশের ওয়েবসাইটে ২০১০-২০১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন অপরাধের পরিসংখ্যান থেকে তেমন চিত্রই লক্ষ করা যায়:

অপরাধের ধরন	২০১০-২০১৯ পর্যন্ত বিভিন্ন বছরে সংঘটিত অপরাধের পরিসংখ্যান									
	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯
অপহরণ	১০৫৯	১০৬৯	৯৬৪	১০২১	১১৫৫	৯৩৩	৭২২	৬৫৭	৫৬২	৬৮
হত্যা	৩৯৮৮	৩৯৬৬	৪১১৪	৪৩৯৩	৪৫১৪	৪০৩৭	৩৫৯৬	৩৫৪৯	৩৮৩০	৩৫১
নারী ও শিশু নির্যাতন	১৭৭৫২	২১৩৮৯	২০৯৪৭	১৯৬০১	২১২৯১	২১২১০	১৮৪৪৬	১৭০৭৩	১৬২৫৩	১১৩৯
পাচার	৮৭০	৭৯২	৮৫০	৮৭৯	৯২০	৮০৫	৬৩৯	৫০৯	৪৪৪	৪৬
মাদকদ্রব্য (পুনরুদ্ধার)	২৯৩৪৪	৩১৬৬৬	৩৭২৬৪	৩৫৮৩২	৪২৫০১	৪৭৬৬৬	৬২২০৮	৯৮৯৮৪	১১২৫৪৯	৯০৬৯
চোরাচালান (পুনরুদ্ধার)	৬৩৬৩	৫৭১৪	৬৫৭৮	৬৪৩৭	৬৭৮৮	৬১৭৯	৪৬৮০	৫৫৯৯	৪৫০১	৩৬৬
মোট সংঘটিত অপরাধ	৫৯,৩৭৬	৬৪,৬২৬	৭০,৭১৭	৬৮,১৬৩	৭৭,১৬৯	৮০,৮৩০	৯০,২৯১	১,২৬,৩৭১	১,৩৮,১৩৯	১১,০৩৯

সূত্র: www.police.gov.bd

উল্লিখিত পরিসংখ্যানে ২০১০ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সংঘটিত মোট অপরাধের ক্রমবর্ধমান চিত্র থেকে জনজীবনে সামগ্রিকভাবে অস্থিতিশীলতা আর অনিশ্চয়তার দিকটিই প্রকাশ পায়, যা সুস্থ ও স্বাভাবিক নাগরিক জীবনের একবারেই বিপরীত। যদিও পুলিশ-প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৯ সালে সামগ্রিক অপরাধ হ্রাসের দিকটি প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু ২০১৯-২০২০ সালে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত অপরাধের ধরন ও সামগ্রিক চিত্র থেকে মনে হয় দেশ আবার ভয়াবহ এক অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের মাধ্যমে জানা যায়, ২০১৯-২০২০ সালে বাংলাদেশে খুন, হত্যা, মাদক, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, চালকের বেপরোয়া ড্রাইভিং-এ সড়ক দুর্ঘটনা ও মৃত্যু, দুর্নীতি, রাজনৈতিক সহিংসতা, সাইবার অপরাধ, ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন মারাত্মক হারে বেড়ে গিয়েছে। ২০১৯ সালের জুলাই মাসে দেশে মোট ৪৫০ জন নারী ও কন্যা শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে মোট ১৭০টি। ধর্ষণের শিকার ১৩৭জন। গণধর্ষণের শিকার ২৩জন। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ১০জনকে। আর ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে ১জন।[৪০] আবার মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর নভেম্বর ২০২০ বুলেটিনে প্রকাশিত রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত সময়ে দেশে ১৩৪৯জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছে এবং ১৪৫১টি শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।[৪১] বর্তমানে দেশের জন্য অন্যতম উদ্বেগের বিষয় হলো কিশোর অপরাধ। বিভিন্ন কারণে কিশোররা আজ নানা সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে সমাজের কাছে একরকম ত্রাসে পরিণত হয়েছে। এমন পরিস্থিতি শুরুতে নগরকেন্দ্রিক থাকলেও বর্তমানে তা গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছে। "গ্যাং কালচার"-এর নামে দিন দিন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার কিশোররা। স্কুল-কলেজ পড়ুয়া এসব কিশোর জড়িয়ে পড়ছে খুন, ধর্ষণ, ছিনতাই, মাদক, অপহরণ, চাঁদাবাজি ইত্যাদি নানা অপরাধে। এমনকি তারা অবৈধ অস্ত্র বহন ও সেগুলোর বেআইনি ব্যবহারের মাধ্যমেও ভয়াবহ অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। দেশের দুই কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, সেখানে থাকা কিশোরদের ২০ শতাংশ খুনের মামলার আর ২৪ শতাংশ নারী ও শিশু নির্যাতন মামলার আসামি। দেশে কিশোর অপরাধ কতটা বেড়েছে পুলিশের রেকর্ডকৃত পরিসংখ্যান দেখলে তা খুব সহজেই বোঝা যাবে। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০১২ সালে কিশোর অপরাধের ঘটনায় সারা দেশে মামলা রেকর্ড হয়েছে ৪৮৪ টি। মামলায় আসামির সংখ্যা ৭৫১ জন। ২০১৩ সালে কিশোর অপরাধের ৫৮৯ মামলায় আসামি ৮৪৮জন। ২০১৪ সালে মামলা হয়েছে ৮১৮টি; আসামির সংখ্যা ১২৬৩জন। ২০১৫ সালে ১১৮৪টি। ২০১৬ সালে এ সংখ্যা ছিল ১৫৯৬টি। এ হিসেবে এক বছরে কিশোর অপরাধের মামলা

বেড়েছে প্রায় ৩৪ শতাংশের বেশি। আর ২০১৭ ও ২০১৮ সালে এ সংখ্যা আরো বেড়েছে।[৪২] আবার মাদকদ্রব্যের আসক্তি থেকে ভয়াবহ নানা অপরাধের উৎপত্তি ঘটছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং তার মানসিক ও শারিরীক বিপর্যয় ঘটে। ফলে সে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, নারী ও শিশু নির্যাতন, সহিংসতা, চাঁদাবাজি ইত্যাদি বড় বড় সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। তাই মাদকদ্রব্যকে এক কথায় বলা যায়, সকল মন্দ কাজের আঁতুরঘর। মাদকাসক্ত ব্যক্তি যেই হোক, সে সমাজের জন্য হুমকি। বাংলাদেশে বর্তমানে মাদকাসক্তি, মাদক চোরাচালান, মাদক-সংশ্লিষ্ট অপরাধ অসহনীয় হারে বেড়ে গিয়েছে। মাদক ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের নানা পর্যায়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ বিষয়ে রক্ষককেও আক্রান্ত হতে দেখা গিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে মাদকদ্রব্যের দূষিত ছোবল এমনকি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো কোনো অংশে লক্ষ করা গিয়েছে। অতি সম্প্রতি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ৬৮ সদস্যের ডোপটেস্টের ফল পজিটিভ এসেছে। মাদক সেবনের দায়ে কনস্টেবল থেকে উপপরিদর্শক পদমর্যাদার এসব পুলিশের মধ্যে ইতোমধ্যে ১০ জনকে চাকরিচ্যুত এবং ১৮ জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।[৪৩] আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে চালকের বেপরোয়া ড্রাইভিং-এর কারণে সড়কে প্রাণহানি আজ দুর্ঘটনা থেকে হত্যার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে ঘটে যাওয়া সড়ক দুর্ঘটনা এবং তার কারণে প্রাণহানির পরিসংখ্যান এমনটাই প্রমাণ করে। ২০১৯ সালে দেশে ৪৭০২টি সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে ৫২২৭জনের।[৪৪] এছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ের নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের একরকম নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে টিকটক, ফেসবুক, ইউটিউব ইত্যাদির মতো নানা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। অধিকাংশ মানুষ এসব মাধ্যম বিষয়ে সঠিক জ্ঞান ও ধারণা না নিয়ে কেবল আত্মতুষ্টি ও বিনোদনের নিমিত্তে এসব মাধ্যমের অনিয়ন্ত্রিত ও যথেচ্ছ ব্যবহার করছে, যার পরিণতিতে আশঙ্কাজনক হারে ঘটছে সাইবার অপরাধ এবং এক্ষেত্রে নারীরাই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। সাইবার অপরাধ এবং প্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার নিয়ে মানুষকে সচেতন করার কাজে নিয়োজিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের একটি গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, দেশে সাইবার অপরাধের শতকরা ৫২ ভাগ ভুক্তভোগীই নারী।[৪৫] এখানে সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া কিছু অমানবিক অপরাধের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তবে অপরাধের প্রকৃত চিত্র আরো ভয়াবহ ও তার বিস্তৃতি আরো ব্যাপক।

সুতরাং সাম্প্রতিক বাংলাদেশের অপরাধের চিত্র দেখে মনে হয় সামাজিক, রাষ্ট্রীয় নানা অপরাধ যেন মামুলি ব্যাপার। অপরাধ সংঘটনের পর অপরাধীর যথাযথ শাস্তি না

হবার কারণে অপরাধ প্রবণতা মহামারির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গুর হবার কারণে অপরাধী যেন অপরাধ সংঘটনের সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, যার কারণে দেশে অপরাধের কেবল বৈচিত্র্যই নয়, অপরাধের ধরনের লোমহর্ষক ও ভয়াবহ রূপ আজ আশঙ্কাজনক হারে লক্ষণীয়। সমাজ সুস্থ্য হলে সে সমাজে আদর্শ মানুষ তৈরি হয়। আর এর বিপরীত হলে সমাজে মন্দ মানুষ তৈরি হয়। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অবস্থা আজ নাজুক। তাই সমাজের নানা স্তরে অপরাধের ভিন্ন ভিন্ন জগৎ তৈরি হয়েছে। এ অবস্থার উত্তরণ কেবল নৈতিক বক্তৃতা কিংবা সংস্কারের মাধ্যমে সম্ভব নয়। পাশাপাশি প্রয়োজন অপরাধীর প্রতি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ। প্রয়োজন কঠিন শাস্তি আরোপ এবং তার যথাযথ বাস্তবায়ন, যাতে করে অপরাধীর মনে অপরাধ বিষয়ে বিরূপ মানসিকতা তৈরি হয়। সে বা তারা যেন বুঝতে পারে যে অপরাধ করে পার পাওয়া যায় না। জীবন দিয়ে কৃত অপরাধের মূল্য দিতে হয়। তাই বলা যেতে পারে অপরাধীর চরম শাস্তিই কাম্য। কিন্তু বাস্তবিক ও ব্যবহারিক দিক চিন্তা করলে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে-বিপক্ষের আলোচিত যুক্তিগুলোর ওপর নির্ভর করে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মুশকিল। অর্থাৎ নির্দ্বিধায় বলা যায় না যে 'মৃত্যুদণ্ড সমর্থনযোগ্য' অথবা 'সমর্থনযোগ্য নয়'। তবে দণ্ডবিধির ইতিবৃত্ত এটাই নির্দেশ করে যে জনমত মৃত্যুদণ্ডের উচ্ছেদই কামনা করে। সাম্প্রতিক সময়ে দেশে ধর্ষণের চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নির্ধারণ করে আইন প্রণয়নের পর সমাজের বিভিন্ন মানুষের আন্দোলন ও প্রতিক্রিয়াতেই তার প্রমাণ লক্ষ করা যায়। কাজেই জনগণ যে মৃত্যুদণ্ডবিরোধী, তা অস্বীকার করা যায় না। তারপরও কিছু মারাত্মক অপরাধ যেমন: রাষ্ট্রদোহিতা, নিরপরাধের প্রাণহরণ, ধর্ষণ, মাদক চোরাচালান, শিশু বলাৎকার ও হত্যা ইত্যাদির ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ও তার দ্রুত এবং যথাযথ বাস্তবায়ন না হলে সমাজ ও রাষ্ট্র দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। তাই সাম্প্রতিক বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে এমন কিছু অপরাধের বিপরীতে প্রয়োজন কঠিন ও কঠোর শাস্তির। তবে সেক্ষেত্রে বিচারিক প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা দূর করে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রকৃত অপরাধী বা অপরাধীদের এমন শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

তবে এটিও সত্য যে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেবল কঠোর শাস্তি আরোপই যথেষ্ট নয়। ব্যবহারিক প্রেক্ষাপটে অপরাধ সংঘটনের কারণ অনুসন্ধান, উপলব্ধি এবং একই সাথে তা দূর করা অধিক কাম্য ও যুক্তিযুক্ত। কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী Lester Pearson এবং আমেরিকার সাবেক এটর্নি জেনারেল Ramsey Clark-এর বক্তব্যে এমনটিই প্রতিধ্বনিত হয়। তাঁরা মূলত গুরুতর অপরাধের বিপরীতে চরম শাস্তির পরিবর্তে অপরাধের কারণের প্রতি জোর দেন। তাঁরা বলেন, অপরাধ নির্মূল বা হ্রাসকরণে চরম

শাস্তির পরিবর্তে যে কারণে, যে পরিবেশে বা প্রেক্ষাপটে অপরাধ সংঘটিত হয়, তা দূর করা অপরাধ নির্মূলে অধিক কার্যকর। তারা আরো বলেন, অপরাধমূলক ঘটনার ক্ষেত্রে অপরাধের কারণ দূর করা উল্লেখযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী পার্থক্য করে দিতে পারে।[৪৬]

বাংলাদেশের আইনি ব্যবস্থার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। মৃত্যুদণ্ড সর্বদা আইনের শাসনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। তারপরও বলা যেতে পারে, বাংলাদেশের সংবিধানে Pearson এবং Clark-এর মতের সমসুর লক্ষ করা যায়। পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ডের রায় ও তার বাস্তবায়নের হার এখনও তুলনামূলকভাবে কম। ২০১৭ সালে ২৩টি দেশে ৯৯৩ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছিল এবং ৫৮টি দেশ ১৭২২ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। চীনে প্রতিবছর দুর্নীতি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রদোহী কার্যক্রম বিষয়ক অপরাধের জন্য হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়।[৪৭] সেখানে ২০১০ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত দেশে মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রদান করা হয়েছে ২০৬৮ টি এবং এর মধ্যে ৩০ টি মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করা হয়েছে।[৪৮] বাংলাদেশ দণ্ডবিধি[৪৯] অনুযায়ী প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত ও দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্যে শাস্তির বিধান রয়েছে। অপরাধী যাতে পুনরায় অপরাধ করতে না পারে, অপরাধীর পাপের অনিবার্য প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে এবং উদাহরণের মাধ্যমে অপরাধী ও জনগণকে অপরাধ থেকে নিবৃত করার উদ্দেশ্যে শাস্তির বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ দণ্ডবিধিতে ছয়টি অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে। সেগুলো হলো: এক. রাষ্ট্রদোহিতা (১২১ এবং ১৩২ ধারা); দুই. মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান (১৯৪ ধারা); তিন. নরহত্যা (৩০২ এবং ৩০৩ ধারা); চার. নাবালক কিংবা উন্মাদ ব্যক্তির আত্মহত্যায় সহায়তা করা (৩০৫ ধারা); পাঁচ. যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির নরহত্যার প্রয়াস (৩০৭ ধারা); ছয়. নরহত্যার সাথে ডাকাতি (৩৯৬ ধারা)। [৫০] আর দণ্ডবিধিতে বিভিন্ন ধারায় ৫৫টি ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে। সম্প্রতি ধর্ষণের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে এদেশে আইন সংশোধন করা হয়েছে। তবে লক্ষণীয় যে বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে গুরুতর অপরাধের বিপরীতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান থাকলেও নানা ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করার সুযোগ শাসনব্যবস্থায় রয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত হতে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হলেও সরকার দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবন ভিক্ষা দিতে পারে। দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি উক্ত দণ্ড মওকুফ করতে পারেন। আবার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত স্ত্রীলোকের গর্ভে সন্তান থাকলে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিলম্ব করতে হয় অথবা উচ্চ আদালত গর্ভজনিত কারণে মৃত্যুদণ্ড হ্রাস করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে। আবার দণ্ডনীয় নরহত্যার অপরাধে দোষী ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবার পর যদি দেখা যায় যে এমন পরিস্থিতিতে হত্যাকাণ্ডটি

ঘটেছে, যে পরিস্থিতি সরকারের বিবেচনায় অপরাধীর প্রতি অনুকম্পা সৃষ্টি করে, তাহলে তাকে সরকার তার শাস্তি কমিয়ে যাবজ্জীবন দণ্ড দিতে পারে।[৫১] বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার অংশের ৩২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না'।[৫২] 'কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না'।[৫৩] বাংলাদেশে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দণ্ডিতরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হাইকোর্টে আপিল করতে পারে। এটি যদি ব্যর্থ হয়, তবে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উচ্চ আদালতেও আপিল করতে পারেন। এরপরও দণ্ডপ্রাপ্ত বা দণ্ডপ্রাপ্তদের মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট সাধারণ ক্ষমার জন্য আবেদন করার অধিকার বাংলাদেশ সংবিধানের রয়েছে। এ সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরেই বাংলাদেশে যে কোনো মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। সুতরাং লক্ষণীয় যে বাংলাদেশের সংবিধানের প্রকৃত উদ্দেশ্য মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে নয়, বরং এতে এটি প্রবেশন দিয়ে একজন অপরাধীর সংস্কারকে সমর্থন করে এবং শেষ অবধি মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁর করুণার অধিকারের মাধ্যমে কাউকে ক্ষমা করতে পারেন। মৃত্যুদণ্ডের আকারে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এজন্য প্রবর্তন করা হয়েছিল, যাতে এ ধরনের শাস্তি অপরাধীকে অপরাধ প্রতিরোধ বিষয়ে প্রভাবিত করতে পারে।

আমাদের মত হলো মৃত্যুদণ্ড অপরাধ নির্মূল করে না। এটি এক রকম ছদ্ম সমাধান, যা প্রকৃতপক্ষে সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূলে কার্যকর ও বাস্তবিক পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে আমাদের মনোনিবেশকে সরিয়ে নেয়। এটির মাধ্যমে আসলে সমাজকে রক্ষা করা যায় না। বর্তমান জটিল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান ও গ্রহণে ব্যর্থতার কারণে মানুষ নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান না করতে পারার কারণে নানা সামাজিক শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়, যা মানুষের মনে সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে তীব্র হতাশা ও নৈরাশ্য সৃষ্টির মাধ্যমে একরকম সমাজবিদ্বেষী মনোভাব তৈরি করে। এমন অবস্থায় মানুষ সামাজিক আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। সে কারণে স্থিতিশীল সামাজিক পরিবেশ জরুরি। পাশাপাশি আইনের প্রায়োগিক দুর্বলতার দিকটিও দূর করতে হবে। একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে, অপরাধ প্রবণতা মানুষের জন্মগত কোনো বিষয় নয়, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক কারণে মানুষ অপরাধী হয়ে ওঠে। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো সামাজিক দায়িত্বগুলো ঠিকমতো পালনে ব্যর্থ হবার কারণে সমাজে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে। সমাজ প্রতিনিধিগণ ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করলে অপরাধীরা অপরাধ করার আগে ভাবত যে অপরাধ করে সমাজে পার পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সঠিক

সামাজিকীকরণ প্রয়োজন। সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে প্রথম প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। পারিবারিক মূল্যবোধ ও শিক্ষা আমাদের আচরণ, মূল্যবোধ, ধারণা, বিশ্বাস, নৈতিকতা, শিক্ষা ইত্যাদির ভিত্তি গড়ে তোলে। সমাজের আদিম ও অন্যতম এ প্রতিষ্ঠানই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন ও আচরণের ভিত্তি রচনা করে। কাজেই সমাজ ও রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার যদি কঠোরভাবে ছোট-বড় সব অন্যায়কে প্রতিহত করতে ও অন্যায় না করতে শেখায়, তবে সমাজে অপরাধের মাত্রা, পরিসংখ্যান, প্রবণতা সর্বদাই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। এছাড়াও শিক্ষা ব্যবস্থায়ও বড় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। কেবল বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা আর প্রচলিত তথাকথিত আধুনিক ধারার সাথে তাল মেলানো বা খাপ খাইয়ে নেবার উদ্দেশ্যে নয়, আদর্শিক এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ রেখে কর্মমুখি ও মুক্তচিন্তার বিকাশে সহায়ক শিক্ষানীতি, পরিকল্পনা এবং তার সদিচ্ছাভিত্তিক সঠিক বাস্তবায়ন প্রয়োজন। কেননা সঠিক ও প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে বুদ্ধিবৃত্তিক আদর্শ মানুষ গড়ে তোলা সম্ভব। এছাড়াও একটি দেশের নেতৃত্বদানকারী গোষ্ঠীকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে দেশে আদর্শ নাগরিক, না কি দুর্নীতিগ্রস্ত অনুগত অনুসারী প্রয়োজন। আজকের সময়ের একটি বড় সংকট হলো স্থায়ী ও অনুসরণযোগ্য আদর্শ ও নেতৃত্বের অপ্রতুলতা। জাতীয় জীবনে ঐক্যের সংকটের কারণে অভাব রয়েছে জাতীয় আদর্শ ও নেতৃত্বের এমন কোনো মডেল, যাকে নতুন প্রজন্ম অনুসরণ করবে। তাই বর্তমানে বড় প্রয়োজন এমন আদর্শ চরিত্র, যাকে বা যাদেরকে অনুসরণ করে এবং যাদের প্রেরণায় নতুন প্রজন্ম গঠন করবে একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র। তাই বলা যায়, সামগ্রিক সমাজ ব্যবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন না হলে কেবল শাস্তির ভয়াবহতা কিংবা কঠোরতা বাড়ালেই সমাজ থেকে অপরাধ হ্রাস পায় না বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অর্থাৎ সর্বোপরি আমাদের সামাজিক উন্নয়নের দিকেই মনোযোগী হতে হবে। প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের যথাযথ লালন এবং ব্যবহারিক জীবনে তার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে সুষ্ঠু সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি এবং সত্যিকারের আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই কেবল সমাজে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

তথ্য নির্দেশ

১. Satris Stephen, *Taking Sides: Clashing Views on Controversial Moral Issues,* The Dushkin Publishing Group, inc., Guilford, 1990, p. 194.

২. Grčič Joseph, *Moral Choices. Ethical Theories and Probelms,* West Publishing Company USA, 1989, p. 330.

৩. Godwin, W., *An Enquiry Concerning Political Justice and Its Influence on General Virtue and Happiness,* Alfred A. Knopf, New York, 1926.

৪. Rashdall Hastings, The Theory of Punishment, *International Journal of Ethics,* Oct., Vol. 2, No. 1, pp. 20-31.

৫. Kent Greenawalt, Punishment, *The Journal of Criminal Law and Criminology,* Vol. 74, No. 2, 1983, p. 347.

৬. H. L. A. Hart, The Presidential Address: Prolegomenon to the Principles of Punishment, *Procedings of the Aristotelian Society,* Vol. 60, 1959, pp. 1-26.

৭. Grčič Joseph, *op. cit.,* p. 331.

৮. Singer P., (ed.), *A Companion to Ethics,* Blackwell Publishers Ltd., Oxford, UK, 2000, p. 366.

৯. Lillie W., *An Introduction to Ethics,* London, Methven, 1966, p. 252.

১০. হাম্মুরাবি, মতান্তরে খাম্মুরাবি, ব্যাবিলনের ষষ্ঠ সম্রাট। আদতে ষষ্ঠ সম্রাট হলেও তিনি নিজেকে ব্যাবিলনের প্রথম সম্রাট হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। সমগ্র মেসোপটেমিয়া, ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিম এশিয়ায় দখল নিয়ে তিনি 'সর্বাধিপতি' উপাধি ধারণ করেন। ১৯০১ সালে পারস্যের সুসা নগরীতে ফরাসি প্রত্নতত্ত্ববিদ জ্যক মর্গানের নেতৃত্বে খননকারী দলের কালো পাথরের স্মৃতিস্তম্ভে উৎকীর্ণ আইন ফলকের নিদর্শন আবিষ্কার হওয়ার পূর্বে প্রায় ২০০০ হাজার বছর লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল হাম্মুরাবির আইন সংহিতা। হাম্মুরাবির আইন সংকলন পৃথিবীর আইন প্রণয়নের ইতিহাসে সর্বপ্রথম। হাম্মুরাবির প্রায় ৪০০ বছর আগে নাম্মু সুমেরীয় রাজা লিবিট ইশতার একটি প্রাচীন আইন সংকলন করেন। এছাড়া সুমেরীয় রাজা ডুঙ্গিও আইন সংকলন করেন। কিন্তু এ সব আইন অপূর্ণাঙ্গ ছিল। হাম্মুরাবিই প্রথম এ সব আইনের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ আইন সংকলন করেন। তিনি ব্যাবিলনের অলিখিত আইনের সংকলন ছাড়াও অনেক নতুন আইন সংযোজন করেন। তবে তিনি কোনো নতুন আইন তৈরি করেননি। আইন সংগ্রহ করে সেগুলোকে সংকলন এবং এর ভিত্তিতে বিচার সম্পন্ন করা ছিল তাঁর কৃতিত্ব।

১১. হোসেন দেলোয়ার এবং সিকদার কুদ্দুস, *সভ্যতার ইতিহাস: প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ১৫১-১৫৯।

১২. Satris Stephen, *op. cit.,* p. 170.

১৩. Grčič Joseph, *Loc. cit.,* p. 331.

১৪. Satris Stephen, *Loc. cit.,* p. 170.

১৫. Satris Stephen, *op. cit.,* p. 171.

১৬. Wellman Carl, *Morals & Ethies,* Prentice-Hall, inc., New Jersey. 1988, p. 244.

১৭. Satris Stephen, *op. cit.*, pp. 172-173.

১৮. Cohen I. Andrew and Wellman Heath Christopher, *ContemPorary Debates in Applied Ethies*, Blackwell Publishing Ltd, UK (oxford) 2005, p. 109.

১৯. Cohen I. Andrew and Wellman Heath Christopher, *Ibid*, p.116.

২০. Wellman Carl, *op. cit.*, p. 248.

২১. Cohen I. Andrew and Wellman Heath Christopher, *Loc. cit.*, p.109.

২২. Wellman Carl, *op. cit.*, p. 249.

২৩. Wellman Carl, *Ibid*, p. 250.

২৪. Nathanson Stephen, *An Eye for an Eye?: The Immorality of Punishing by Death (Modernity and Political Thought)*, 2nd ed., Rowman and Littlefield Publishers, 2001.

২৫. Cohen I. Andrew and Wellman Heath Christopher, *Ibid*, p. 108.

২৬. Cohen I. Andrew and Wellman Heath Christopher, *Loc. cit.*

২৭. Cohen I. Andrew and Wellman Heath Christopher, *Loc. cit.*, p. 108.

২৮. Satris Stephen, *op. cit.*, p. 182.

২৯. Mappes A. Thomas, Zembaty S. Jane, Grazia De David, *op. cit.*, p. 145.

৩০. Wilson J., The Justification of Punishment, *British Journal of Educational Studies*, Jun., 1971, Vol. 19, No. 2, pp. 211-212.

৩১. John Monahan, (Reviewed Work) Crime and Human Nature by James Q. Wilson and Richard J. Herrnstein, *The Yale Law Journal*, Jun., 1986, Vol. 95, No. 7, pp. 1536-1551.

৩২. Mappes A. Thomas, Zembaty S. Jane, Grazia De David, *Loc. cit.* p. 145.

৩৩. Mappes A. Thomas, Zembaty S. Jane, Grazia De David, *op. cit.*, p. 150.

৩৪. Cohen I. Andrew and Wellman Heath Christopher, *op. cit.*, p. 113.

৩৫. Ehrlich Isaac, *The Deterrent Effect of Capital Punishment: A Question of Life and Death*, National Academy Press, New York, 1973.

৩৬. Satris Stephen, *op. cit.*, p. 183.

৩৭. Cohen I. Andrew and Wellman Heath Christopher, *op. cit.*, p. 113.

৩৮. Cohen I. Andrew and Wellman Heath Christopher, *Loc. cit.*, p. 113.

৩৯. Cohen I. Andrew and Wellman Heath Christopher, *Ibid*, p. 109.

৪০. *দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন*, *০৭ আগস্ট* ২০১৯, লিংক: https://www.bd-pratidin.com/city/2019/08/07/446897.

৪১. *আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)*, লিংক: http://www.askbd.org/ask/? wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=131

৪২. https://www.sonalinews.com/m/opinion/news/132288.

৪৩. *দৈনিক আমাদের সময়*, ২২ নভেম্বর ২০২০, লিংক: https://www.amader shomoy.com/post/287463.

৪৪. *দৈনিক প্রথম আলো*, ০৮ জানুয়ারি ২০২০, লিংক: https://www.prothomalo.com/bangladesh/২০১৯-সালে-৪৭০২-সড়ক-দূর্ঘটনায়-প্রাণ-গেছে-৫২২৭-জনের

৪৫. https://www.bbc.com/bengali/news-44187267.

৪৬. Satris Stephen, *op. cit.*, pp. 182-183.

৪৭. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/04/death-penalty-facts-and-figures-2017/

৪৮. http://odhikar.org/wp-content/uploads/2020/02/Death-Penalty-2010-2019.pdf

৪৯. দণ্ডবিধি দণ্ড সম্পর্কিত আইন। কোনো কর্ম বা কর্মবিরতি যা আইনের চোখে দণ্ডনীয়, তা করা বা না করার দণ্ডভোগ করতে হয়। দণ্ডবিধিতে শুধু কার্যকে অপরাধ বলা হয়নি, কার্যবিরতি বা বিচ্যুতিও সমভাবে দণ্ডনীয়। এ আইনটি ১৮৬০ সালে প্রণীত এবং এটি ১৮৬২ সালের ১লা জানুয়ারি কার্যকর হয়। লর্ড মেকলের সভাপতিত্বে ভারতীয় আইন কমিশন এ দণ্ডবিধির প্রথম খসড়া প্রস্তুত করেন। ভারতীয় দণ্ডবিধি হিসেবে এটির আত্মপ্রকাশ ঘটলেও পরবর্তীকালে 'দণ্ডবিধি' নামকরণে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে প্রচলিত রয়েছে এবং বাংলাদেশে এটিই 'বাংলাদেশ দণ্ডবিধি' নামে পরিচিত। শতবছরের অধিক পুরনো এ সংহিতা যুগের দাবিতে ভারত, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানে বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত রূপ পরিগ্রহ করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত আবিষ্কার অপরাধের কৌশল ও শৈলী পরিবর্তন করেছে। ফলে লাগসই এবং যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের প্রয়োজনেই এমন সংশোধন করা হয়েছে। (গাঙ্গুলী, বাসুদেব, *দণ্ডবিধি*, কামরুল বুক হাউস, ঢাকা, ২০২০।)

৫০. গাঙ্গুলী, বাসুদেব, *দণ্ডবিধি*, কামরুল বুক হাউস, ঢাকা, ২০২০, পৃ. ৭০।

৫১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬-৭৭।

৫২. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০১৬, পৃ. ৯।

৫৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০।